তহমিনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আভাস

*তুরাণ রাজ্য অন্তর্গত সামান গাঁ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী প্রান্তর। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত। চতুর্দ্দিকে যেন দাউ দাউ করিয়া অগ্নি-শিখাসম রৌদ্র তেজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। বায়ু বেগহীন। বৃক্ষপত্র সকল নীরবে স্থির। মধুমাসের প্রথম ভাগ। অনাবৃষ্টিহেতু বহুদূরব্যাপী, ধূলি-কণাসকল ধূমাকারে প্রান্তর হইতে আকাশপথ ঘিরিয়া রহিয়াছে। রবিতাপে সময় সময় ঐ ধূমপুঞ্জ হইতে ধূলিকণাসকল অগ্নিকণার ন্যায় চাকচৈক্য দেখাইয়া, ধূমপুঞ্জে মিশাইয়া যাইতেছে।

এমন সময় এক অশ্বারোহী যুবাবীর বীরদাপে, বীরসাজে, বীরত্বের সহিত যথাসাধ্য অশ্ব চালনা করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, শরবিদ্ধ মৃগ অন্বেষণে মহাবলে ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত।

ঐ যে সুতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মৃগরাজ[১] নাকেমুখে রক্ত বমন করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। বীরবর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, জীন ও লাগাম খুলিয়া অশ্বকে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুপদ বার বার চুম্বন করিয়া, নতশিরে সেলাম বাজাইয়া আহার অন্বেষণে মধ্য প্রান্তরে চলিয়া গেল। যুবাবীর নিকটস্থ বৃক্ষমূলে, প্রিয় অশ্বের জীন পালানে শয্যা রচনা করিয়া সদ্য বধ্য মৃগমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। প্রিয় অশ্ব প্রান্তরের কোন দিকে বিচরণ করিতেছে, দেখিয়া রচিত শয্যায় শয়ন করিলেন।

যুবাবীর মৃগয়ামোদে বড়ই অনুরক্ত। শার্দ্দুল, গণ্ডার, মত্তহস্তী, বন্যবরাহ এবং পশুরাজ সিংহ ভিন্ন, সে সুতীক্ষ্ণ বাণ ক্ষুধানিবৃত্তির কারণ না হইলে, নিরীহ মৃগজাতি বক্ষে কখনই বিদ্ধ হয় না। যুদ্ধবিদ্যায়, রণ-কৌশলে, বাহুবলে, সর্ব্বদেশ বিখ্যাত। বন-বিহার মৃগয়ামোদ সুখ উপভোগ করাই বীরবরের ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। পরিশ্রমের পর যেই শয়ন অমনি নিদ্রাকর্ষণ!

যেস্থানে বীরবরের ঘোটক বিচরণ করিতেছিল। দুইজন পথিক সেই স্থানে যাইয়া

---

*'হাফেজ', জানুয়ারি, ১৮৯৭।

১. 'মৃগরাজ' অর্থ সিংহ। এখানে শব্দটির ভুল প্রয়োগ হয়েছে। আসলে লেখক হরিণ শব্দের অর্থে 'মৃগরাজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়া ঘোটকের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, গঠন, বর্ণ, কর্ণ, পুচ্ছ এবং শরীরের চিহ্ন সকল দেখিয়া, উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে, ঈঙ্গিতে দুই একটি কি কথা বলিয়া অতি ত্বরিতপদে, অশ্বারোহী যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং অতি সাবধানে বীরবরের আপাদমস্তক, মুখের গঠন, বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া মহা আনন্দিত হইল। বীরবরের কোনরূপ অসুখের কারণ না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মহা সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিতে করিতে তীর গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব তাহার গন্তব্যপথে বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন। অস্তাচলের নিকটবর্ত্তী প্রায়। যুবা ঘোর নিদ্রিত। তাহাকে জাগায় কে? তাহার নিদ্রা ভাঙ্গায় কে? বিজন প্রান্তরে বৃক্ষমূলে একা নিদ্রিত, সে ঘুম, বীরবরের সে ঘুম ভাঙ্গায় কে?

প্রান্তর মধ্যে 'ধর ধর' 'গেল গেল' 'এইবার গেল' এই সকল শব্দ হইতেছে। এবং নিদ্রিত যুবাবীরের অশ্বকে কয়েকজন দেশীয় লোক ঘিরিয়া ঐ সকল কথা কহিতেছে। অশ্ব পিছাড়া ঝাড়িতেছে। লম্ফে লম্ফে দন্তাঘাত করিতেছে। ধাইয়া ধাইয়া আক্রমণকারীদিগকে দৌড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কেহ পিছন দিক হইতে দড়ি দড়া ফাঁস দিয়া আট্‌কাইবার চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর দিকে আসিতে বার বার চেষ্টা করিতেছে এবং বিকট চিৎকার করিয়া উপস্থিত বিপদ-বিষয় প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করাইতে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে। যুবাবীর নিদ্রার আবেশে এমনি অজ্ঞান যে, প্রিয় অশ্বের বিকট চিৎকার আক্রমণকারীদিগের কোলাহল, ধর ধর, ঐ গেল, পালাল, দড়ি ছিঁড়িল, ইত্যাদি কোন শব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না।

কতক্ষণ? মনুষ্য সহিত অশ্বের যুদ্ধ কতক্ষণ? আক্রমণকারীদের মধ্য হইতে দুই তিনজন অশ্বের গায়ে, গলায়, পায়ে দড়ি জড়াইয়া একজন বলিল,—

"ওহে ভায়া! প্রাণের মায়া আছে? এই ঘোড়া ধরে রাজকন্যার নিকট নিতে না পারিলে, কাহারও মাথা ঘাড়ে থাকবে না।"

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ঘোড়ার গলায় দড়ি খুব জোরে টানিয়া ধরিয়া বলিল—

"ওহে ভায়া! ঘাড়ে যে মাথা থাকবে না তা ত বুঝি। কিন্তু দাদা! এক প্রেমের খাতিরে কতজনের জান মারা যাবে! প্রেম পিরিত কি বালাই!

তৃতীয় ব্যক্তি সক্রোধে বলিল—

"প্রেম পিরিত কর! ওদিক যে গলায় বাঁন্দন দাঁতে কেটে ছিঁড়ে দুই টুকরা করে ফেল্লে? আর ত রাখা যায় না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—

"ওহে ভায়া! তাই ত দেখতে পাচ্ছি। মাত্র পায়ের আর কোমরের বাঁন্দনটা আছে। ঘোড়া না নিতে পাল্লে আমাদের মাথা ত কাটা যাবেই রাজনন্দিনীই কি থাকবেন! তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ঘোড়া আটকাইতে না পাল্লে আপন বুকে আপনি ছুরি বসাবেন।"

তৃতীয়—"এই বেঁধেছি। ধর ধর, এই দড়াটা ফিরিয়ে গলায় পেঁচ দিয়ে দেও দেখি। শক্ত করে ধর—আর যাবে কোথা?"

দ্বিতীয়—"ধরেছি। ওহে ধরেছি। ভয় নাই, যাবে কোথা? (ঘোড়াকে সম্বোধন করিয়া) ও পক্ষীরাজ। ভেবেছি কি? তোমাকে ছাড়ছি না। নাথিয়ে দুইজনার মাথা ভেঙ্গেছ। ৪/৫ টির শরীরের স্থানে স্থানের মাংস দাঁতে তুলে নিয়েছ? তোমাকে ধরিলেও মরণ না ধরিলেও মরণ। তোমাকে নিয়ে রাজ্যকন্যা তহ্‌মিনার নিকট হাজির করিলেই ইনাম বকশিস্ যা চাইব তাই পাইব। তোমাকে হাতে পেলে তার প্রাণ বাঁচে। প্রাণের প্রাণ তোমাকে কি ছাড়তে পারি? তুমি পিছাড়া ঝাড়ো, দাঁতে দাঁতে ঠেকাইয়া দন্তাঘাত করো, পায়ের খুরের চাপে মাথার খুলি উড়াও, প্রাণের প্রাণ—অশ্ব—তোমায় ছাড়তে পারি না।

ধর ধর আর রসিকতার কাজ নাই। নিয়ে হাজির কর্ত্তে পাল্লে বাহাদুরী!

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলে সকলে একজোট হইয়া একত্রে সাবধানে সতর্কে ঘোড়ার গলায় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া রাজধানী "সামান গাঁ" অভিমুখে মনের আনন্দে হাসি রহস্যে লইয়া চলিল।

যাইতে যাইতে প্রথম ব্যক্তি বলিল—ভাই সকল! একটি কথা। এখন ত একপ্রকার নির্ভাবনাই হওয়া গেল। আচ্ছা ভাই একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্তে চাই, তোমরা কি বল যে? তাইতো বলি, আবার বলতে চাইনে। কথাটা কি? ঘোড়ার সঙ্গে রাজকন্যা তহমিনা দেবীর প্রণয় কি প্রকারে হলো?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—ভায়া! ভাল কথা তুলেছ? আমিও তাই দুই তিনবার ভেবেছি! কথাটা কি? আসবার সময় আর কেউ কেউ এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল।—আমি ভাই ঠিক উত্তর দিতে পারি নাই। তবে মনে মনে ভেবেছি। রাজা রাজড়া বড়লোকের কাণ্ড—কি জানি কি হবে।

তৃতীয় হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাইরে! তুই যে মজলি দেখছি, কথাটা কি জান? ঘোড়ার সঙ্গে প্রণয় নয়। আবার এক প্রকারে আছেও। ঘোড়াটা তাঁর ভালবাসার। কাজেই ভালবাসার ভালবাসা,—হৃদয়ের ভালবাসা।"

"বুঝলেম না। এত ঘোর-ফেরে-বুদ্ধির বেড়ে আসিল না। কিছুই বুঝলেম না।"

"এ আর এত বেশী ঘোর পেঁচাও কি? এ ঘোড়া যাঁর তাঁর জন্যে রাজকন্যা পাগল। তাকে বিয়ে কর্ত্তে চান।"

"বা—দাদা খুব বুঝালে। তবে তাকে না এনে ঘোড়া ধরে আনলে কেন?"

"কারণ আছে।"

"কারণ যাই থাক্। তিনি কোথা আছেন? চল ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাই। আমাদের রাজকন্যা যার জন্যে পাগল তাকে ফেলে ঘোড়া কেন? ছেড়ে দেও ঘোড়া? আসল থাকতে নকল কেন? খোদ মালিক থাকতে বাহন কেনরে ভাই।"

"আরে ভায়া সে বড় শক্ত কথা। এই ঘোড়ার সওয়ার কোথায় আছে জানি না। তবে

রাজকন্যার দাসীদের মুখে শুনেছি, রাজবাড়ীর প্রায় চাকরই শুনেছে। সত্যিমিথ্যা ভগবান জানেন। রাজকুমারী কোন এক বীরযুবার বীরত্ব, সাহস বলবিক্রমের প্রশংসা শুনে তাঁহার প্রতি মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে দিবারাত্র সেই ধ্যান কচ্ছেন।"

"রূপ দেখলেন কি করে?"

"চিত্রপট পর্য্যন্ত আনিয়ে দেখেছেন! তাই ত আরো পাগল হয়েছেন।"

"তাই ত ভায়া! বড়লোকের সকলই উল্টো! এর আশ্চর্য্য? পাগল করিল দো-পায়া, ধরে আনি চার-পায়া? কেমন মিল। কেমন বিরহ বিকারে ঠাণ্ডা দারু। ভাল ভাল। ভাল কথা! ঘোড়া দেখলে কি পাগলামি সারবে?"

"কি জানি ভাই! ঘোড়াটা ধরে নিচ্ছে কেন? তা ত কিছুই বুঝতে পারলেম না। তবে ভালবাসার ভালবাসা, চক্ষে দেখতে পেলেও চক্ষু ঠাণ্ডা হয়।"

দ্বিতীয় বলিল—"যাই বল ভায়া! রাজরাজড়ার কথা—বড়ো লোকের কথা, পিরিত প্রণয়ের কথা, তাদের স্নেহ-মমতার কথা—আমাদের মাথাতেই আসে না। আমরা তো বুঝতেই পারি না। ঘোড়সওয়ারের নাম কি জানি না। ঘোড়াটি এদেশে কি প্রকারে এলো তা আমরা কেউ জানি না।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল—"তোমরা যাই বল! আসল কথা হচ্ছে রাজকুমারী সে বীরযুবার ছবি দেখে আর তার গুণ-গরিমার কথা শুনে, সাহস, বলবীর্য্য, হাতিমারা, রাক্ষসমারার প্রশংসা শুনে তার উপর একেবারে পাগল হয়েছেন। এ ঘোড়া যে সেই বীরযুবার ঘোড়া সে কথা তিনি বোধ হয় কার মুখে শুনে থাকবেন। ভালকথা এতেও অনেকটা বুঝা যায় যে,—এ ঘোড়া ধরার কাণ্ড কারখানা রাজকুমারী নিজেই কচ্ছেন। তা না হলে জমাদারে হুকুম শুনিয়ে দিল যে, ঘোড়া ধরে আনবি। না আনতে পাল্লে রাজকন্যার হুকুমে মাথা কাটা যাবে। এনে রাজনন্দিনীর প্রমোদোদ্যানের গুপ্তদ্বার দিয়া, একেবারে ধাত্রীমাতার নিকট লইয়া যাইবি। তিনি যে হুকুম করেন, তাই তামিল করিবি। পুরস্কার পারিতোষিক ইনাম বক্‌শিশ্ যা বরাতে থাকে সমুদয় ধাত্রীমাতার নিকট প্রাপ্ত হইবি। সাবধান রাজদরবারে কি প্রকাশ্যে কোন কার্যকারকের নিকট এ ঘোড়ার কথা ঘুর্ণাক্ষরে[১] মুখে আনিবি না।"

"আচ্ছা ভাই! তা ত শুনলেম্। একটি কথা কি? রাজকন্যা যে এইরূপ পাগল হয়েছেন, তা তার পিতামাতায় শুনেছেন?"

"রাজ্যের প্রায় লোক শুনেছেন—রাজরাণীও শুনেছেন, শুনে কি করবেন। তাঁরা রাজকন্যার বিয়ের জন্য কত চেষ্টা করলেন কিছুতেই কিছু হলো না। কোনখানে বিয়ে কর্ত্তে তার মন বসিল না বোঝ ত ভায়া! মায়া সকলেরই সমান। একটি কন্যা রাজপুরি মধ্যে, রাজার সংসার মধ্যে ঐ একটি মাত্র কন্যা। তাকে দুঃখ দিয়ে তাকে নারাজ করে, চলে কি প্রকারে? রাজা, রাজকন্যার বিয়ে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা মেয়েকেই দিয়ে দিয়েছেন।

১। সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে 'ঘুণাক্ষর' শব্দটি 'ঘুর্ণাক্ষর' হয়েছে।

যাতে সে সুখী হয়, চিরকাল যাকে নিয়ে থাকতে হবে, তার পছন্দসই কাজ করে। সেই ভাল। আরো শুনেছি। সে বীরযুবা ভারি পালওয়ান। তিনি মায়ের জনন দ্বার হতে জন্মেন নাই। তাঁর মায়ের পেট চিরে বের কর্ত্তে হয়েছিল।

সে কি কথা? পেট চিরে মানুষ বেরয়। সে মা বাঁচলো কি মলো?

"ও অনেক কথা! শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া চাই। যে বীরবর মায়ের পেট চিরে বেরলেন। তার পিতা কে? 'সিং মোরগ' নামে এক বৃহৎ পাখী, দশ বারটা হাতী চুঙ্গলে করে উড়ে বেড়ায়, সমুদ্র পার হয়ে যায়। সেই সিং মোরগ বীরবরের পিতাকে প্রতিপালন করেছিল। সেই পাখী বনের পাখী হইলেও তার ভারী মায়া। সেই পাখী, বীরযুবা আর এই ঘোড়া তার মায়ের পেট চিরে তাকে বের করে ক্ষতস্থান কি কৌশলে জুড়িয়ে দেয়। সেই বীরযুবা কত হাতী মেরেছে, কত রাক্ষস মেরেছে, কত সিংহ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, গণ্ডার মেরেছে তার ইতি নাই।"

"রাজকন্যার ত বড় সাহস। এমন রাক্ষসমারা, হাতীমারা, সিংহমারা মানুষের সঙ্গে ঘরকন্না করা কম কথা নয়। কোন সময় প্রাণটা নিয়ে বসবে?"

যাক সে ভাবনা যার সে ভাবুক। আমাদের ভাবনা যা তাই দেখ। সন্ধ্যাও হয়ে এলো শীঘ্র শীঘ্র এই যম নিয়ে যেতে পাল্লে রক্ষা। দেখ! ওরে চক্ষুর ভাব দেখ। একটু ছুট পেলে আর রক্ষা থাকবে না। বাবা! যে মানুষের ঘোড়া, শুনলেই গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। ধন্য, সাহস রাজনন্দিনী তহমিনার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কারণ

সামান গাঁ নগরের অধীশ্বরের কন্যা তহমিনা রূপেগুণে স্বদেশ বিখ্যাত। সামান গাঁ নগরের রাজমুকুট কালে তহমিনার শিরেই শোভা পাইবে। এক বংশে একটি মাত্র কন্যা, আদর যত্ন ভালবাসার অবধি নাই, সখী, সহচরী, দাসদাসী, ধাত্রী, সহ রাজবালা রাজকীয় উদ্যানে অতি সমারোহে বিশেষ জাঁকজমকে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করেন। সমায়ান্তে একবার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে* যাইতে হয়। বড়ই আদরের কন্যা। সর্ব্বদা নৃত্যগীত রঙ্গরস আমোদ-আহ্লাদে দিবারাত্র হাসি খুসিতে দিন যাপন করেন।

একদা প্রধান মন্ত্রী মুখে ইরানাধিপতি, কায়কাউস রাজের প্রধান সেনাপতি বীরবর রোস্তমের গুণানুবাদ, বিশেষ বীরত্বের কথা শুনিয়া মনে মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। সময়ে রাজা ও রাণীর কর্ণগোচর হইলে তাহারা প্রকৃত অনুরাগ পরীক্ষার জন্য রাজকন্যার বিবাহ আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। রাজবালা তহমিনা বীরবর রোস্তম ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবে না, স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া জনক জননীর নিকট অতি গভীর স্থানীয় কথা অকপটে প্রকাশ করেন। তাহারাও কন্যার অকপট অনুরাগ ও ভালবাসার ভাবলক্ষণ বুঝিয়া, আর কখনও বিবাহের কথা তুলিয়া, প্রাণাধিক তনয়ার মনে আঘাত প্রদান করেন নাই। তাহারা স্বাধীন ভালবাসার বিরোধী হইয়া, কোন কথা কখনও জিহ্বাগ্রেও আনয়ন করেন নাই।

রাজনন্দিনীর অনুরাগ, বীরশ্রেষ্ঠ মহাবীর রোস্তমের প্রতি, অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা, একপ্রাণ হওয়ার বাসনা, অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া এক আত্মা এক প্রাণ হওয়ার ইচ্ছা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে আত্মজ্ঞান হারা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বীরবর রোস্তম ইরানাধিপতির কার্যে যুদ্ধ বিগ্রহে, শত্রুদমনে, দৈত্যদলনে, রাক্ষস নিধনে, হিংস্রজন্তু বিতাড়ণে, গুপ্তশত্রুর অনুসন্ধানে সর্ব্বদা পরিলিপ্ত থাকিতেন। তহমিনার সংবাদ তাহাকে কে উপযাচক হইয়া দেয়। তহমিনার হৃদয়ের আলেখ্য তাঁহাকে কে দেখায়? যে সন্তপ্তহৃদয়ের উত্তেজিত, আন্দোলিত বিচলিতভাবের অবিকল ছবি, তাহাকে কে দেখায়? সে হা হুতাশসহ পরিশুষ্ক কণ্ঠের আপেক্ষ উক্তি সম্পূর্ণ না হউক, অতি সামান্যভাবেই কে তাহার কর্ণগোচর করে? কে এই রোস্তম প্রেমে পাগলিনী রাজনন্দিনীর পবিত্র প্রেম প্রসঙ্গ, হৃদয়ের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যভাবকে তাহার নিকট অকপটে উপস্থিত করে? ঐ রাজবালার অন্তঃস্থলের[১] মধ্যস্থলের সেই ক্ষতটুকু বীরবরকে দেখাইয়া, নিখুঁত খাঁটী সুশীতল প্রেমরসে মিশ্রিত মিলন ঔষধির সুব্যবস্থা কে করে? প্রেম প্রণয় পিরিতির বীজ অতি রসাল হইলেও রাজনৈতিকক্ষেত্রে

---

*'হাফেজ', ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭।

১। অন্তস্তলের

অতিসহজে ফুটে না। সে নিরস ক্ষেত্রে সে অপূর্ব্ব স্নেহময় পবিত্ররসের প্রবাহ ফোয়ারা ছোটে না। অজস্রধারেও ঝরে না। বীরহৃদয়ে ভালবাসা কি?

রাজরাণী কন্যার জন্য বড়ই ভাবিত, নিতান্তই চিন্তিত। সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভিন্ন আর উপায় কি। সেই অনাথ নাথ দীনবন্ধু ভিন্ন আর ভরসা কি। একটি মাত্র কন্যা তাহারও এই দশা। সকলি বিধাতার লীলা!

মানুষ আপদ, বিপদ, সম্পদ, সমভাবে দুঃখ সুখে, সকল অবস্থাতেই সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে, ভালকথা। সহস্র কথার এক কথা। কিন্তু পরমেশ্বরের নির্ভর সহিত ধৈর্য্য, সেই ধৈর্য্যের সহিত সুখ সময়ের পূর্ব্ব দুরবস্থা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া অভাব অনটনের কথা মনে করিয়া "ছিল না, হইয়াছে, আবার হইতে পারে," মনে স্থির করিয়া, হস্তসঞ্চালন করাই শ্রেয়ঃ, পদ চালনা করাই কর্ত্তব্য। দন্ত, জিহ্বা, চক্ষুকে আয়ত্তে রাখিয়া সংসারে চলাফেরাই জ্ঞানীর কার্য্য। আবার আপদে বিপদে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা দয়ার সাগর,—"দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝোরে অবিরত ধারে।" মনে অকাট্যরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে, বিপদ হইতে উদ্ধারের সদুপায় উদ্ভাবন করাও একপ্রকারে ঈশ্বরের অভিপ্রেতই বলিতে হইবে। নিয়তির বিধান যদি অকাট্য, কিন্তু অদৃষ্ট অবলম্বনে, বুদ্ধি বিবেক বিচার সহায়ে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সত্য সরল বিশ্বাস রক্ষা করিয়া বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট, যাহাতে লাঘব হয়, সংসারী মাত্রেরই তাহার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। হাত পা সঙ্কোচ করিয়া শুধু বসিয়া থাকা মানব প্রকৃতির কার্য্য নহে।

মহারাজা প্রাণপ্রতিম দুহিতার দুরবস্থা দেখিয়া বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রোস্তমের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে আদেশ করিলেন। আরও আদেশ করিলেন যে ইরাণ—তীস্তান প্রভৃতি স্থানে যাইয়া গুপ্তচরেরা যে সকল সংবাদ রোস্তম সম্বন্ধে সংগ্রহ করিবে যথা সময়ে কুমারী তহমিনার নিকট আসিয়া জ্ঞাপন করে। সামান গাঁ অধিপতি জানিয়াছিলেন যে, তহমিনার চিত্তপটে প্রমত্তকুঞ্জরঘাতী বীরবর রোস্তমের প্রতিকৃতি চিহ্ন ব্যতীত আর কোন চিহ্ন স্থান পায় নাই। কাজেই কন্যার অভিরুচি মতে আহার বিহার আমোদ আহ্লাদে নৃত্যগীতে সময় অতিবাহিত করিতে দাস দাসী ধাত্রী সহচরীগণ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে এক মনোরম উদ্যান বাটিতে থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গুপ্তচরগণ মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া সামান গাঁ অধিপতি সমীপে প্রকাশ করিল যে, রাজ্যের প্রান্তসীমায় মহাবীর রোস্তম মৃগয়া উপলক্ষ্যে আগমন করিয়াছেন। বৃক্ষতলে অশ্বসাজে শয্যারচনা করিয়া নিদ্রিত আছেন। সুশিক্ষিত অশ্ব স্বাধীনভাবে প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করিতেছে।

সংবাদ শ্রবণে রাজা অস্থির হইলেন। রোস্তমের নাম শুনিয়া মহারাজের হৃদয়-রক্ত পরিশুষ্ক হইতে লাগিল। স্বরাজ্যের প্রান্তসীমায় মহাকাল কালান্তককাল উপস্থিত, কম্পিত কলেবরে একপ্রকার দিশাহারা হইয়া কুমারী তহমিনার নিকট রোস্তমের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে অনুমতি করিলেন।

রাজনন্দিনী এই শুভসমাচার শ্রবণ করিয়া ধাত্রীর সহিত পরামর্শ আঁটিয়া গোপনে বিশেষ বুদ্ধি কৌশলে বীরবরের অশ্ব ধরিয়া আনিতে বিশ্বাসী কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের প্রতি আদেশ হইল—

নির্দিষ্ট অশ্ব ধরিয়া আনিতে পারিলে আশার অতিরিক্ত পুরস্কার। না আনিতে পারিলে শিরচ্ছেদ।

রাজকুমারীর কৌশল ব্যর্থ হয় নাই। বীরবর পথশ্রান্ত ক্লান্ত নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। আরও সাহায্যই করিয়াছে সেই বৃক্ষমূলে ধরাসনে অশ্বসাজে রচিত শয্যায় শায়িত এবং নিদ্রিত। পাঠক! সেই যুবা বীরই ইরান অধিপতি শাহ কায়কাউসের প্রধান সেনাপতি, ভুবন বিখ্যাত জালপুত্র প্রমত্ত কুঞ্জর হস্তা মহাবীর রোস্তম। তহমিনার—

রাজকুমারী তহমিনা, হৃদয়বল্লভের অশ্ব আক্রমণে আদেশ করিয়া কত কি ভাবিতেছেন; কত কথাই মনে উঠিতেছে। অস্থির চঞ্চল উড়ু উড়ু ভাব, কোন কাজেই মন বসিতেছে না। কোন কথাই কানে ভাল লাগিতেছে না। শরীরে যত্ন নাই! পরিচ্ছদ ভালমন্দ বিচার নাই। কখনও শয্যায়, কখনও ধরায়, কখনও কারুকার্য্যখচিত মখমলের মসনদে। কখনও বৃক্ষতলে কখনও সরসীর শ্বেত পাথরে বান্দা ঘাটে, কখনও লতাকুঞ্জে। কখনও প্রস্তর আসনে, কখনও কাষ্ঠাসনে উপবেশন, উত্থান-পদচারণা। কখনও অন্যমনস্কে, দুই একপদ অগ্রসর! কখনও দণ্ডায়মান। কিছুতেই মন সুস্থির হয় না। সহচরিদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় ইচ্ছা হয় না। গীতবাদ্য বহুদিন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দিবারাত্র সেই চিন্তা, সেই বীরবর রোস্তমের রূপ চিন্তা। আজ সেই রূপের সহিত অন্য চিন্তা। ঘরে বাহিরে উদ্যানে, লতাকুঞ্জে, বৃক্ষমূলে সরসীতটে কোন স্থানেই সুখ নাই।

আকাশে চাঁদ তারা হাসিতেছে। শূন্য সাগরে শুভ্রমেঘ ভাসিতেছে। জ্যোৎস্নাজলে ফুটন্ত ফুলের উঠন্তভাব, টলমল ঢলঢল ভাব আটকাইয়া কোন কোন চক্ষে ধাঁধা লাগাইতেছে, হাসি আর গালে ধরে না। যেই কোন বৃক্ষপত্র সরিল, পাতাটা নড়িল, শুষ্কপত্র খসিল, অমনি তহমিনার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ঐ বুঝি কে আসিল। পদাতিক দল বুঝি প্রাণপ্রতিম প্রিয়জনের প্রিয় অশ্ব ধরিয়া আনিল, কি শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিল। না জানি কি সংবাদ! অন্যমনস্কে, যেন কোন কথা মনে নাই। ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ দেখি, রৌদ্র তেজে যে ফুলগুলো মরো মরো ভাব দেখাচ্ছিল, এখন তেমন তাজা কাঁচা কাঁচা ভাব দেখাচ্ছে। জ্যোৎস্নাজালে যৌবন যেন আটকা পড়ে ফুটন্ত ফুলে উঁকি মাচ্ছে। ওদিকে ও শব্দ কিসের?

কথাই আছে—দিনে বুড়ি রাত্রে ছুঁড়ি। কৈ কিসের শব্দ। এত অন্যমনস্কভাব, চঞ্চলভাব কেন? সুস্থির হয়ে মন স্থির করে কার্য্য করুন। এত উতলা হলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। একটু চিন্তা করে দেখুন দেখি, আপনি কেমন গুরুতর কার্য্যে হাত দিয়েছেন। একি কম কথা। যাঁহার নামে সমগ্র পারস্য রাজ্য ত্রাসিত, দৈত্যকুল কম্পিত, মহা মহাবীর শ্রেষ্ঠ মহাবীরের মস্তক অবনত, মহারাজা স্বয়ং সংজ্ঞাহত সভাসদগণ সশঙ্কিত, সেই মহাবীর

রোস্তমের সহিত আপনি যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে। বিজয়লক্ষ্মী জয়মাল্য কোন্ গলে পরাইতে অদৃশ্যভাবে যুগল হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, কে বলিতে পারে? এতে কি আর এত উতলা শোভা পায়? তবে প্রেম-প্রণয় ভালবাসা মায়ামমতার ক্ষমতা অসীম ও অন্য প্রকার। যাই হউক এত উতলা হইবেন না। স্থির হউন। উতলার কার্য্য নহে। প্রেম প্রসঙ্গ বটে। কিন্তু এত বড় কঠিন হৃদয়। সহস্র চক্ষুজলে, লক্ষ লক্ষ অবলার আত্মদানে, কোটী কোটী জীবের কাতর কণ্ঠে যাহার শরীরের একগাছি লোম অন্যমনস্কে একটু নাড়াচাড়া করে না। শুষ্ক মাটিতে যাহারা রক্তস্রোত বহায়, মুহূর্ত্তমধ্যে হাজার হাজার জীবের কলেজা তীর তরবার, বর্শায় পার করে তাহাদের সঙ্গে রমণী হৃদয়ের ভালবাসা কি? সে নীরস কঠিন অন্তরে প্রেমের লীলাখেলা এ কি? কোথায় প্রণয় পিরিত প্রেম আর কোথায় ঢাল, তলবার, মুগুর, লাঠি, কোথায় সুরস-পূর্ণ সুচিকন সুমিষ্ট কথা আর কোথায় আগুনমাখা কর্কশ ব্যবহার। কোথায় অতি মোলায়েম, অতি নরম মাখন হইতেও কমল[১]। আর কোথায় রূঢ় নিরস রক্তারক্তি কাটাকাটি। একেবারে বিপরীত। আমি মরিলে কি হয়? সে গলে কৈ? আমি প্রেম প্রেম করিয়া ঢলাইয়া বেড়াইলে কি হয়? তার মনে কি বলে? দেখা চাই, পরীক্ষা চাই। তবে ত কথা। যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতেই বা আস্থা কি? ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া মন স্থির করুন। যে পথে কৌশলজাল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, শিকার ফাঁদে পড়িলেও পড়িতে পারে। সে নরসিংহ, যে দৈত্যমানব সংহারী, সে প্রমত্ত করীমুণ্ড খণ্ড খণ্ডকারী, বীরবর রোস্তম তহমিনার প্রেম পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেও হইতে পারে।

রাজনন্দিনী তহমিনা শ্যামল দুর্ব্বাদলসম্ভূত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ধরাশয্যায় ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া বসিলেন এবং হাত দুখানি সুকোমল করপল্লবে জড়াইয়া ধরিয়া স্বীয় মস্তক স্পর্শে বলিলেন—"আমি! আমি না বুঝিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। যেভাবে ছিলাম, সেইভাবেই না হয় জীবন শেষ করিতাম। এদেহে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত, হা, রোস্তম! হা রোস্তম! নাম জপ করিয়া যমদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। শেষ শয্যা, শেষ বাক্য পর্য্যন্ত ঐ নাম মুখে করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইতাম, সেও বরং ভাল ছিল, এ কি করিতে কি করিলাম! হায়! আগ-পাছ না ভাবিয়া এ কি করিলাম। ক্ষিপ্ত মনের ন্যায় বালচপলতার ন্যায় বুদ্ধির চাঞ্চল্যে প্রণয়কুহকে পরিণাম না ভাবিয়া, কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি! প্রাণবল্লভ নিদ্রিত, অশ্ব সুদূর প্রান্তরে স্বাধীনভাবে বিরচিত।

*"যে প্রকারে হয় অশ্ব বন্ধন কর। অতি সাবধানে আমার এই পুষ্পোদ্যানে আনয়ন কর। একি সম্ভবপর কথা! যদি অশ্ব সে প্রান্তরে না থাকে লোকে শুনিয়া কি বলিবে? যদি থাকিয়া থাকে, অথচ প্রেরিত পদাতিক দল অশ্ব না ধরিতে পারে? ধৃত করিল অথচ

১। কোমল

*'হাফেজ', মার্চ-এপ্রিল, ১৮৯৭।

এ পর্য্যন্ত আনিতে পারিল না—আনিবার সাধ্য হইল না, তত শক্তি না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? কি জানি বীরবরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া, অশ্বধৃতকারীগণ যদি তাহার হস্তে নিপাতিত হয়, তখনই বা কি হইবে। এই সকল চিন্তায় আমি অস্থির হইয়াছি, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি। আমার প্রাণ ত গিয়াছে। আজ নয় আমি! আজ নহে, বহুদিন দেহ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। হায়! সেই মৃত প্রাণের জন্য কতগুলি জীবন্ত জীব অকারণ সমন-ভবনে গমন করিবে। এ যে একমুখো ভালবাসা। মুহূর্ত্তে[১] মুহূর্ত্তে নিরাশ, পলকে পলকে ত্রাস। যাহা ঘটিবার আমারই ঘটিয়াছে। যাহা দেখিবার আমিই দেখিয়াছি। না হয় স্বপ্নই হইল, না হয় চিত্তপটেই মন আকুল করিল। আমিই দেখিয়াছি, আমিই তাহার গুণাগুণ শুনিয়া রোস্তম নামে পাগল হইয়াছি, রোস্তমরূপে মোহিত হইয়াছি। রোস্তমের বল, রোস্তমের সাহস, রোস্তমের বীরত্বের কথা শুনিয়া আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহমন সে পদে সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ত ইহার কিছুই জ্ঞান নহেন, ঘুণাক্ষরেও ইহার ঘুণ পরিমাণ কথাও তিনি জানেন না। তহমিনা! হতভাগিনী তহমিনা যে রোস্তমরূপে মজিয়াছে, তাহা কি তিনি জানেন?

তহমিনা কে? তাই কি তিনি জানেন? না কিছুই না। তাহাতেই বলিয়াছি—

"এ একমুখো প্রেম!" আমি ভালবাসি—ভালবাসাও ভালবাসে—সে ক্ষেত্রে কথা স্বতন্ত্র, তাহাতে আশা থাকে।—জীবন ভার বোধ হয় না, যদি ভালবাসা যথার্থ হয়, পরস্পর জীবন মরণের দায়িত্ব বোঝে, সে জ্ঞান মাথায় থাকে। তবে চিরবিরহেও সুখ আছে। সে প্রেমে প্রেমত্ব আছে, সে প্রেমের তত্ত্ব আছে। নিরাশ নিশ্বাস নাসারন্ধ্রে কখনই বহিবে না, মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস। এ ত তা নয়, এ একমুখো একতরফা ভালবাসা। একতরফার মূল্য কোথাও নাই প্রণয়ীর নিকটেও গৌরব নাই। যার কথা তার নিকটে ব্যক্ত করিবারও সাধ্য নাই। এ যে ভয়ানক প্রেম!"

ধাত্রী তহমিনার হস্ত দু'খানি ধরিয়া আপন বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া মস্তকে, মুখে, ললাটে বার বার চুমা দিয়া শত্রুর মুখে আপদ বালাই, হস্তের সঞ্চালনে আর মুখের বিকৃতি বোলে সমূলে প্রদান করিয়া বলিলেন।—

প্রাণাধিক! বাছা তহমিনা! যে চিন্তা পূর্বে করা হয় নাই। যে ভাবনা কার্য্যের প্রথমে ভাবা যায় নাই। সে কথা লইয়া আর চিন্তা করায় ফল কি? যাহা হইবার হইয়াছে। যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। এখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করো। আমি বেশ বুঝিতেছি এ ভয়ানক প্রেম, বিস্ময় ব্যাপার।

বহির্দ্বারে, উদ্যান বহির্দ্বারে কোলাহল। হরিষের লক্ষণযুক্ত মানুষের কণ্ঠস্বর। ঐ আসছে—ধরেছে ধরেছে। খুব কপাল! নে বাবা! পারিতোষিক এনাম বকশিশ মাথা করে বয়ে নিতেও পারবি না। আচ্ছা যাত্রায় পা বাড়িয়ে ছিলে? বাপ্‌রে ভয়ানক ঘোড়া। চক্ষু

১। মুহূর্তে

দুটি লাল করে ঘন ঘন হ্রেষারবে নাকসাট, কর্ণ তাড়ণ, পুচ্ছহেলন দেখিয়া কার সাধ্য উহার গায়ে হাত দেয়। সাবাস সাবাস খুব বাহাদুরী করেছ। যে ঘোড়া কত হিংস্র পশু, পায়ের জোড়াখুরের আঘাতে যমপুরী পাঠিয়েছে, সেই ঘোড়ার গলায় দড়ি, পায় দড়ি, কমরে দড়ি লাগিয়ে গো বলদের মত টেনে এনেছে। বাহবা বহুত বহুত তারিপ।

দ্বারপাল, উদ্যানের মালি এবং অন্য লোকে অশ্ব ধৃতকারীগণের বহুতর প্রশংসা ও গুণানুবাদ করিতে করিতে ধাত্রীমাতার নিকট একজন বলিতে, দশজনে ঘোড়া ধরার খবর দিতে বেগে ছুটিল। এই গোলযোগ ও প্রশংসার মূলে অবশ্য কিছু আছে, জানিবার জন্য রাজনন্দিনী ধাত্রীর হস্ত ধরিয়া শ্যামল ক্ষেত্র হইতে উঠিতেই সংবাদ আসিল, অশ্ব ধৃত হইয়াছে, রাজবালার আদেশে অশ্ব ধৃত হইয়া আসিয়াছে। ধৃতকারীরা পুরস্কার প্রার্থনা করে।

রাজনন্দিনী যে দাসীমুখে এ শুভসংবাদ শুনিলেন, তখনই তাহাকে পরাধীন জীবন দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিয়া সহচরী মধ্যে গণ্য করিলেন। অযাচিতভাবে কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত অর্থ ঐ দাসী প্রাপ্ত হইল। পদাতিক দল যাহারা এই অশ্বধৃত কার্য্যের প্রধান নেতা, তাহার আশার অতিরিক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইল।

রাজনন্দিনীর আদেশে ধৃত অশ্ব অশ্বশালায় রক্ষিত হইল না। উদ্যানমধ্যে রাজবালার প্রাসাদের নিকট সুপ্রশস্ত এবং সুগন্ধিযুক্ত প্রকোষ্ঠে বহু যত্নে অতি আদরে ধৃত অশ্ব রক্ষিত হইল। আহা। ভালবাসার ভালবাসা কথাটাই ভালবাসা। তাহার উপর সেই ভালবাসা প্রত্যক্ষ দেখিলে, কি হস্তগত হইলে, মনে কি বলে, তা যার ভালবাসার ভালবাসা সেই জানে। অন্যকে বুঝাইব কি করিয়া? ভালবাসার ভালবাসা, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলি ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। ইহাতে তর্ক নাই, কথা নাই। সন্দেহ নাই। ভালবাসার অতি কদর্য্য, অতি নোংরা[১], অতি কুৎসিৎ অতি জঘন্য জিনিসটি—বিষয়টি ভালবাসার চাইতেও ভালবাসিতে ভালবাসার ইচ্ছা হয়। কিন্তু যদি সে ভালবাসা মূল ভালবাসা, প্রকৃত ভালবাসা হয়। তবে ভালবাসিতে, রাজনন্দিনী তহমিনা, ভালবাসার ভালবাসা ঘোড়াটি যে ভাল বাসিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি! ঘোড়া একটি পশু, তাহাকে অন্য অন্য রাজ অশ্ব নিকট রাজঅশ্বশালায় রাখিবার আদেশ করিলেই ত পারিতেন, ঘোড়াকে ঘোড়ার ন্যায় যত্ন করিলেই ত হইতে পারিত, তাহা না করিয়া এত যত্নের কারণ কি? যার ভালবাসা সেই জানে। যার মনের গুপ্ত রহস্য সেই আলোচনা করে। অশ্বের থাকিবার স্থান সজ্জিত হইল। রাজনন্দিনী স্বহস্তে ঘোড়ার গা মার্জনা করিয়া উৎকৃষ্ট গোলাপ জলে অশ্ববরের মুখ, চোক্ ধৌত করিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর খাদ্যের ব্যবস্থা।

হা তুমি অশ্ব! ভালবাসার ভালবাসা। তোমাকে থাকিবার স্থান দিলাম, আমি জানি তুমি দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাও, তত্রাচ তুমি ভালবাসার ভালবাসা, তাই ত লাল মখমলের বিছানা দিলাম। গলায় সোনার জিঞ্জির পরিয়েছি। চার পায়ে রৌপ্যহার ঝুলাইয়াছি।

১। নোংড়া

রৌপ্যাধারে (রূপার বালতি) সুমিষ্ট জল (কমলালেবু রসে মিশ্রি পানা) রাখিয়াছি। এখন আহার করাই কি? ঘোটকবর এখন তোমার মন রাখি কি দিয়া? মাংস খাবে? না পেটে সহিবে না। তুমি ভালবাসার ভালবাসা মাংস খাইলে পেটে সইবে না। দুধ! সর্ব্বনাশ! দুধ! ও দুধ! তা ত হইতেই পারে না। দুধ কে খায়! ভাললোকের খাদ্য নহে। কে দুধ খায়? ও হবে না, পেট ফাঁপতে পারে। ও অশ্ব তুমি ভালবাসার ভালবাসা। তোমার জন্য চারিদিক নজর রাখিতে হয়। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই খাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না। আহার করো।—মাথা খাও, পেট পুরিয়া আহার করো।

প্রিয় পাঠকগণ! হাসিবেন না। মাথায় দিব্বি দিয়া বলিতেছি, হাসিবেন না। কবিগুরু ফেরদৌসী মহোদয়ের পদাঙ্ক চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই এই 'তহমিনা'। কবিগুরু তুসী যথার্থ স্বাধীন চিত্তের উপাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরস্বাধীন পারস্য রাজ্যে থাকিয়া স্বীয় লেখনী এরূপ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিয়াছেন যে, ভাবিতেও ভয় উপস্থিত হয়। যে পরিপক্ক সুলেখনী হইতে অত স্বাধীনভাব প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহা হইতে সামান্য অশ্বের সহিত মানুষের কথাবার্ত্তা অসম্ভব কি? আশ্চর্য্য কি? হাসিবার বিষয় কি? তবে সে সময়ে এত মানহানির মোকদ্দমা ছিল না। পাঠক! পূর্ব্ব কথা মনে করুন।

আহার করো, মাথা খাও—পেট পুরিয়া আহার করো। তুমি ভালবাসার ভালবাসা, পেট পুরিয়া আহার করো। কি দিয়া তোমার মন যোগাই। ভালবাসার ভালবাসা তুমি? কি দিয়ে তোমার মন যোগাই।

এখন রাজনন্দিনী তহমিনা কি বলিতেছেন শুনুন—

"তোমরা এখনি আমার সেই ভালবাসা অশ্বতরী", সেই পঞ্চকল্যাণী শ্বেতবর্ণ অশ্বতরীকে, এই ভালবাসা অশ্বসহিত সংমিলন করাইয়া দেও, সাবধান এখনই আজ্ঞা প্রতিপালন কর।"

কর্ম্মচারীদিগকে এই আদেশ করিয়া রাজনন্দিনী শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন।

পাঠক! ভাবিতে পারেন কথাটা কিরূপ হইল। কবিগুরু কি এতই স্বাধীনভাবে লেখনীগতি পরিচালনা করিয়াছেন। যে একজন অবিবাহিতা রাজকন্যা—তাহার দ্বারা এরূপ ঘৃণিত বিষয়ের অবতারণা করিলেন—সে কি কথা! কবিগুরুর নিতান্তই ভ্রম। সময়ে যে এ কথার উত্তর দিতে হইবে, লোকে উত্তর চাহিবে, তিনি একথা ভাবেন নাই। নিতান্তই ভ্রম। ভ্রম নহে। আমাদের ভ্রম। শুনুন কথা ঃ—

তহমিনা রাজনন্দিনী স্বাধীনা। তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাদের চিন্তা হইতে বহু ব্যবধান। বহুদূর। কে জানে? কে বলিতে পারে—বীর জননী, বীর প্রসবিনী, বীরদুহিতা, বীরজায়াদিগের সুদূর চিন্তা। সেই ভাবী দূর চিন্তার ভাবী সুফলের সূচনা। সুযোগ সংযোগ মিলন। কে জানে ইহার ভিতরে কি আছে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নিদ্রাভঙ্গ

রজনী প্রভাত হইল। কাহারও সুখে, কাহারও দুঃখে, কাহারও মধ্যভাবে, এই ত্রিবিধভাবে, চন্দ্রতারা সহিত রজনী প্রভাত হইল। পাখিরা ঈশ্বরের গুণ-গান করিয়া অরণ্য আমোদিত করিল। প্রভাতবায়ু প্রান্তর মজাইল সুন্দরী উষা শুভ্র বসনে পূর্ব্বদিক হাসাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তুসকল জঙ্গলের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিল। দিনমণির আগমন ভাব বুঝিয়া দিনকানা পেঁচার দল কোঠরে ঢুকিল। জগৎলোচন রবিদের পূর্ব্বগগনে দেখা দিলে, বীরবর রোস্তম ঈশ্বরের নাম করিয়া শয্যা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। তাহার বিস্ফারিত লোহিত লোচনদ্বয়, ক্রমে প্রান্তরের উপর দিয়া যতদূর দৃষ্টির আয়ত্ত, তাহা দেখিয়া আসিল তখনই দৃষ্টি ফিরিল। বামে দক্ষিণে বাঁকা নয়নে নয়নপাত করিয়া সে বিশাল দৃষ্টি পুনরায় সুস্থির ও একাগ্রচিত্তে দক্ষিণবামে ঘুরিয়া সম্মুখ প্রান্তরে পড়িল। জীবজন্তু পরিশূন্য ময়দান ধূ-ধূ করিতেছে। বীরবর রোস্তম, চক্ষুদ্বয় করপল্লবে, শেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যতদূর সাধ্য বিশেষ মন সংযোগে দেখিলেন। কিছুই নাই। কোন জীবজন্তু প্রান্তরে নাই কি আশ্চর্য্য। ঘোড়? ঘোড়া কৈ? আমার ঘোড়া কৈ? সে ঘোড়া সামান্য ঘোড়া নহে? সে নব নব মোলায়েম ঘাসের লোভে এ ময়দান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, একথা নিতান্তই অসম্ভব। কখনও কোনদিন আমাকে এরূপভাবে রাখিয়া ঘোড়া কোথায় যায় নাই। ময়দানে, জঙ্গলে, যুদ্ধস্থানে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, সমুদ্রতটে, যেখানেই বিশ্রাম করি, নিশা যাপন করি, নিদ্রিত অবস্থায়, আমার নিদ্রিত অবস্থায় অশ্ব আমার প্রহরীর কার্য্য করে। কোন কারণেই আমাকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে যায় না। যাইবে না। অশ্ব আমার নিকটবর্ত্তী থাকিয়া নিশীথ রাত্রে প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করে। যাহাতে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তদপ্রতি দৃষ্টি রাখে। নিদ্রিত অবস্থায় হিংস্রজন্তুগণ আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক সাবধানে শয়ন স্থানের চারিদিকে পদচারণা করিতে থাকে। বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে, অতি মৃদু মৃদু ভাবে হ্রেষা রবে আমাকে জাগাইতে থাকে। সামান্য বিপদে সে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করে না। সে নিজেই তাহার প্রতিকার করে। সে সকল কথার ভাব ত কিছুই দেখিতেছি না। একি আশ্চর্য! এ জীবনে যাহা ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল! কত দানব, দৈত্য নররাক্ষস রাজ্যে দুর্জ্জয় সমরে এই অশ্ব লইয়া গিয়াছি। কত হিংস্র জন্তু, কত বন্য পশু, কত পাহাড় জঙ্গলমধ্যে, কত নিশা, কত বৃক্ষমূলে, শীলাতলে, সমুদ্রকূপে, কত রজনী অতিবাহিত করিয়াছি, কোনদিন কোন স্থানে আমার প্রিয় অশ্ব এরূপভাবে অন্তর্দ্ধান হয় নাই। আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যায় নাই। আজ একি কথা! কি আশ্চর্য ঘটনা! সামান্য প্রান্তর মধ্যে, শত্রুবিহীন দেশমধ্যে, আমার ঘোড়া, চারপায়া জন্তুটা বায়ুভরে শূন্যে উড়িয়া গেল! তুরাণ রাজ্যে রোস্তমের নাম কে না জানে? ঐ ও

ধু ধু করিতেছে। সমান গাঁর প্রান্তসীমা ধু-ধু করিতেছে, এদেশে রোস্তমের ঘোড়া কে না চেনে? এই ক্ষুদ্র রাজ্য সন্নিকট প্রান্তর হইতে আমার ঘোড়া, রোস্তমের ঘোড়া উড়িয়া গেল?

রোস্তম শয্যা হইতে উঠিয়া বৃক্ষমূলের চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং মুখে বলিলেন—

হাঁ এই অশ্বসহায়ে কত দৈত্য ধ্বংস করিলাম। কত রাক্ষসকুল বিনাশ করিলাম। সামান্য হরিণ শিকারে আসিয়া চির প্রিয় অশ্ব হইতে বঞ্চিত হইলাম। এখানে থাকিয়া আক্ষেপের ফল কি? বার বার চক্ষু ঘুরাইয়া না চাইয়া ময়দান জঙ্গল দেখিয়াই বা লাভ কি? দেখি, অন্বেষণ করিয়া দেখি। চারিদিক সন্ধান করিয়া জানি আমার অশ্ব কি হইল? গেল কোথা? কোন শত্রুকুল, কি হিংস্রজন্তু, কি কোন নরনারী, কৌশলে বলে ছলে, চক্রে আমার অশ্বকে অপহৃত কি প্রাণবধ করিয়া থাকে, তবে রোস্তমের হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। তাহাকে জীবন্ত মৃত্তিকায় দাবাইয়া দিব। না হয় অগ্রে জীন তাহার পিঠে বাঁধিয়া, মুখে লাগাম চড়াইব। আর এই কশাঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বিন্দু বিন্দু রক্ত ধারের সহিত ফোটায় ফোটায় বাহির করিব।

এই বলিয়া মহাবীর রোস্তম, অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, অসি হস্তে ঘোটকান্বেষণে বৃক্ষমূল হইতে প্রান্তরের দিকে গতি করিলেন। যে স্থানে অশ্ব বিচরণ করিয়া উদর পরিপোষণ করিয়াছে, সে স্থানের মৃত্রিকায় পরিষ্কার পদচিহ্ন প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছে। ঐ পদচিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, ক্রমে ঐ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে ক্রমেই সামান গাঁ অভিমুখে চলিলেন। যতই লোকালয় নিকট বোধ হইতে লাগিল ততই অশ্বের পদচিহ্ন স্পষ্ট ও বেশী পরিমাণ চোক্ষে পড়িতে লাগিল। প্রান্তর পার হইয়া লোকালয় প্রবেশ করিলে, অধিবাসীরা রোস্তমকে দেখিয়া ভয়ে ভীত ও সশঙ্কিত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। ঘোড়ার সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না। গ্রাম গ্রাম পল্লী পল্লী প্রান্তর প্রান্তর পবনগতির অগ্রে অগ্রে বীরবর রোস্তমের আগমন বৃত্তান্ত চারিদিক বিস্তার হইয়া পড়িল। সামান গাঁ অধিপতির কর্ণেও রোস্তমের আগমন যথাসময়ে প্রবেশ করিল। আরও শুনিলেন যে, ভয়ঙ্কর বেশে মহা ভয়ঙ্কর ক্রোধের লক্ষণ—অসি হস্তে অশ্ব সন্ধানে আসিতেছেন, ক্রমেই রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

অসমাপ্ত